॥ শ্রীহরি ॥

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ গীতা পঢ়ें, পঢ়ायें, জীবন में लायें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 15: পুরুষোত্তমযোগ

2/2 (শ্লোক 7-20), শনিবার, 14 অক্টোবর 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ ড: আশু গোয়েল মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/bYLe_8gbY60

ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ

প্রার্থনা ও দীপ প্রজ্জ্বলনের পর আজকের বিবেচন সত্র শুরু হয়। ভগবানের অপার আশীর্বাদ এবং আমাদের পূর্বজন্মের কর্ম এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে আমরা সবাই গীতা সাধনায় মগ্ন হয়েছি। মহাপুরুষরা বারবার বলেছেন যে গীতার মত কল্যাণকর আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। আমরা গত বিবেচনে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ছয়টি শ্লোক নিয়ে চিন্তন করেছি। ভগবান যোগেশ্বর শ্রী কৃষ্ণ এই অধ্যায়টিকে স্বয়ং শাস্ত্রের উপমা দিয়েছেন। একটি উল্টানো বৃক্ষের উপমা দিয়ে তিনি পৃথিবীর ব্যাপকতার কথা এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যোনির উৎপত্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। কেন আমরা কেন বারবার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আটকা পড়ে যাই? বাস্তবে আমাদের কামনা-বাসনার কারণেই আমরা আটকে পড়ি, কিন্তু কীভাবে?

অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্ত্বা

কিভাবে আমরা অসঙ্গের শস্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারি। গত সপ্তাহের বিবেচনে আমরা শুকদেব মুনি এবং জনক রাজার গল্প বোঝার চেষ্টা করেছি।

ভগবান যোগেশ্বর শ্রী কৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন যিনি আমার ধামে আসেন, সেই ধাম কেমন হয় ?

স্বয়ং-প্রকাশিত।

ভগবানকে যখন দীপ্তিময় বলা হয় তখন তা হলো রূপক।

উপনিষদে বলেছে-

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

ভগবানকে জ্যোতির রূপ বলা হয়েছে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রেই ভগবানকে জ্যোতির্ময় বলে বর্ণনা করা হয়নি। খ্রিস্টানরা ঈশ্বরকে ডিভাইন লাইটও বলে। মুসলমানরা একে নূর-ই-ইলাহীও বলে। পারসি ধর্মে সূর্যকে ঈশ্বর বলা হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে এই সমস্ত শব্দগুলি হলো উপমা কারণ একমাত্র ঈশ্বরই ঈশ্বরের মতো হতে পারেন। পঞ্চ ভূত(পাঁচটি মৌলিক উপাদান-পৃথিবী, বায়ু,আকাশ, জল ও অগ্নি) যখন ঈশ্বরের দ্বারাই নির্মিত, তাহলে তিঁনি কিভাবে তাদের মধ্যে একজন হতে পারেন?

ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে এই পঞ্চ ভূতের উর্দ্ধে। ঈশ্বরের মূল আরাধনা চারটি রূপে করা হয়। সগুন পূজা চার প্রকার- ভগবানের নামের পূজা, ভগবানের রূপের পূজা, ভগবানের লীলার পূজা এবং ভগবানের ধামের পূজা। যে এই সগুন পূজার অলৌকিক স্বরূপ বুঝে নেয়, সেই ভক্তি প্রাপ্ত করে। যে ঈশ্বরের লৌকিক বা জাগতিক স্বরূপে আটকা পড়ে আছে, সে এখনো ভক্তি পথের প্রারম্ভিক অবস্থায় রয়েছে।

ঈশ্বর সপ্তম অধ্যায়ে নিজের এবং জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকটি পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মলীন স্বামী রামসুখদাস জীর অত্যন্ত প্রিয় শ্লোক ছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক-

মমৈবাংশো জীবলোকে, জীবভূতঃ(স্) সনাতনঃ
মনঃ(ষ্) ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি, প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥১৫.৭॥

ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত জীবাত্মারা আমারই অংশ এবং তা সনাতন। দুটি শব্দ আছে: সনাতন এবং পুরাতন। দুটির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে পুরাতন অর্থাৎ এটা জানা যায় না কত বছর আগের, যেমন সূর্যের জন্ম লক্ষ লক্ষ বছর আগে। সনাতন অর্থাৎ যার কখনো উৎপত্তি হয়নি এবং যার কোনো অন্ত নেই । যা সর্বদা আছে এবং অনন্তকাল থাকবে।

গোস্বামী জী এই শ্লোকটি একটি সুন্দর কবিতার মাধ্যমে বলেছেন:

ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী।।

জীব ঈশ্বরেরই অংশ। (অতএব) সে অবিনাশী, চেতন, শুদ্ধ এবং স্বভাবগতই সে সুখের রাশি।

15.7

মমৈবাংশো জীবলোকে, জীবভূতঃ(স্) সনাতনঃ
মনঃ(ষ্) ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি, প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥7॥

এই জগতে আমারই সনাতন অংশ জীবরূপে অবস্থিত ; কিন্তু সে প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করে (নিজের বলে মেনে নেয়) ॥ ৭ ॥

বিবেচন: এই শ্লোকটি পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মলীন স্বামী রামসুখদাস জীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রী ভগবান বলেছেন জীবাত্মা হলো আমারই অংশ এবং এটি সনাতন।

দুটি শব্দ আছে, সনাতন ও পুরাতন। আমাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়েছে। দুটির শব্দের মধ্যে পার্থক্য হল যে পুরাতন অর্থাৎ এটা জানা যায় না এ কত পুরানো, যেমন সূর্যের জন্ম কোটি কোটি বছর আগে হয়েছে। সনাতন অর্থাৎ যার কখনো উৎপত্তি হয়নি, যা কখনো শেষ হবে না, যা সর্বদা বিদ্যমান এবং সর্বদাই থাকবে।

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত। সূর্য দেবতার বয়স কোটি কোটি বছর। ব্রহ্মার বয়স কোটি কোটি বছর, কিন্তু

তার একটা সীমিত সময়কাল আছে। যারা নতুন নতুন আধ্যাত্মিক পথে আসে তাদের মনে একটি প্রশ্ন থাকে যে ঈশ্বর জীবাত্মাকে প্রথমবার কখন সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নটি আমাদের মনে এই জন্যে আসে কারণ আমাদের বুদ্ধি জড় এবং জড় বুদ্ধি দ্বারা অনন্তকে বুঝতে পারা যায় না। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা অসীম, অনন্তকে বুঝতে পারি না, যদিও আমরা এটা জানি যে মহাকাশ অনন্ত ছায়াপথ(Galaxy) আছে, কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে এক মিলিয়ন গ্যালাক্সি থাকবে।

ভগবান বলেছেন যে এই জীবাত্মা সনাতন। আমরা মনে করি আমাদের সকলের আত্মা আলাদা আলাদা কিন্তু আসলে তা নয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, শরীর যদি ভিন্ন হয় এবং প্রকৃতি ভিন্ন হয় তাহলে আত্মা এক কিভাবে হতে পারে? এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাক, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং তা বড় বড় পাওয়ার হাউসে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে শহরের প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং তারপরে আমাদের এলাকার ট্রান্সফরমারে নিয়ে আসা হয়। তারপর ইলেকট্রিক পোলের মধ্যে দিয়ে একটি পৃথক তারের মাধ্যমে আমাদের বাড়িতে প্রেরণ করা হয়। আমরা এই বিদ্যুৎকে আমাদের বাড়ির প্রতিটি ঘরে সুইচ বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি। এখন বলুন এই বিদ্যুৎ ভিন্ন নাকি সেই একই? এর উত্তর হলো, এক। আমাদের বাড়িতে এবং আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ির বিদ্যুৎ কি আলাদা নাকি এক? এরও উত্তর হলো এক, কিন্তু উভয় গৃহের ইলেকট্রিক বিল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এইপ্রকারে এই আত্ম তত্ত্ব একই, যা শক্তি, চেতনা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তা একই। এই সমগ্র সৃষ্টিতে একই চৈতন্য তত্ত্ব আছে। এমন নয় যে ভগবান এই চৈতন্যকে শত কোটি টুকরো করেছেন। এটাই একতার সিদ্ধান্ত **'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'**।

এটা কর্ম দ্বারাই নির্ধারিত হয় যে কোন জীবকে কোন যোনিতে জন্ম নিতে হবে।

একটি শব্দ পরমাত্মা, একটি শব্দ আত্মা, একটি শব্দ জীবাত্মা এবং একটি শব্দ জীব(দেহধারী)। এই চারটি শব্দ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই জিনিসের সংকেত দেয়। আমরা যখন সমগ্র চেতনা শক্তির কথা চিন্তা করি তখন তা হলো পরমাত্মা। যখন আমরা আমাদের ইলেকট্রিক মিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ সীমাবদ্ধ করি এবং কেউ সেই বিদ্যুৎ চুরি করে, তখন আমরা বলি যে আমার বিদ্যুৎ চুরি হয়েছে, এটি হলো ব্যষ্টি ভাব। যখন আত্মা স্বতন্ত্র থাকে, তখন তার কোন কষ্ট থাকে না, সুখ থাকে না, আসক্তি থাকে না, কিন্তু যখন তার সাথে সঞ্চিত কর্ম যুক্ত হয়ে যায়, পাপ-পুণ্যের হিসাব যোগ হয়, কামনা বাসনার সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন তাকে জীবাত্মা বলে। আর যখন এই জীবাত্মা কোন দেহে প্রবেশ করবে, সে মানবদেহ হোক, পশু হোক, গাছ হোক, নদী হোক বা করোনাভাইরাস হোক, তখন তাকে দেহধারী বলা হবে।

পরমাত্মা থেকে আত্মায়, তারপর জীবাত্মায় এবং অবশেষে দেহধারী। এটি একই তত্ত্ব দিয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। ভগবান বলেছেন যে এই দেহে যে সনাতন আত্মা আছে, তা আমারই একটি অংশ এবং তাই আমরা সকলেই সেই পরম শক্তিরই এক অংশ এবং সেই কারণেই আমরা এই পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ বলি। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা, সে আমিই, **'শিবোহম্ শিবোহম্'।**

আমিই সেই শিব। কিন্তু এটা তখনই ঘটে যখন আমি পরমাত্মার সাথে একরূপ হয়ে যাই এবং নিজেকে এই দেহ থেকে পৃথক মনে করি। আমার ভুল এটাই হয়েছে যে আমি সিংহের বাচ্চা, কিন্তু জন্মের সাথে সাথে আমি নেকড়েদের সাথে থাকতে শুরু করেছি। নিজেকে কখনো চিনতে পারিনি তাই সে নিজেকে নেকড়ে বলে ভাবতে শুরু করেছি। আমরা মনুষ্যদেহে জন্ম নিয়েছি এবং অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে বাস করি, যারা বলে যে আমিই এই দেহ এবং এই কথা শুনে আমরাও নিজেকে এই দেহ বলে মেনে নিই। আমরা পুণ্যবান যে স্বামী গোবিন্দদেব গিরি জী মহারাজের মতো একজন মহাপুরুষ আমাদের সেই দৃষ্টি প্রদান করেছেন, যার কৃপায় আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতার চিন্তন, মনন এবং অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করেছি। তখন আমাদের মনে এই বোধ আসে যে আমি এই দেহ নই, আমি এই দেহের অতিরিক্ত অন্য একটি সত্তা। এই শরীর প্রতি মুহূর্তে বদলে যায়। যদি আগে নিজের শৈশবের ছবি না দেখে থাকি তবে আজকের দিনে সেই ছবি দেখে নিজেকে চিনতে পারবো না যে এটি আমি । বালকের যে অনুভূতি ছিল যে এ হলাম আমি, বিশ বছর বয়সেও তার মধ্যে সেই একই অনুভূতি রয়ে গেছে। আমার বদলে

যাওয়া শরীরে যা কখনো বদলায়নি, তা শুধু আমিই। প্রতি মুহূর্তে যা পরিবর্তিত হচ্ছে তা কেবলমাত্র শরীর।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যে ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ই সক্রিয় থাকে। ধরুন আমরা বিবেচন শুনতে বসেছি, আমাদের মনোযোগ যদি অন্য কোথাও থাকে তাহলে সেখানে বসে থাকা সত্বেও আমাদের মন সেখানে থাকবে না, কেউ যদি তখন আমাদের জিজ্ঞেস করে আশু ভাইয়া কি বললেন? আমরা কোনো উত্তর দিতে পারবো না কারণ আমরা সেখানে উপস্থিত থেকেও না থাকার সমান ছিলাম। আজকাল আমাদের সবার অবস্থা এমনই হয়ে গেছে। আপনি খাবার খাবার সময় যদি ফোনে কথা বলেন বা ফোনের মাধ্যমে কোনো কাজ করছেন, তখন আপনি যা খাচ্ছেন তার কোনো স্বাদই আপনি অনুভব করতে পারবেন না।

এই বিষয়ে স্বামী শরনানন্দ জী মহারাজ একটি সূত্র লিখেছেন যে, নিজেকে দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘোরাবে না, কারণ যাকে তুমি দৃষ্টি দেবে, তাকে তোমার মনও দিতে হবে। মন সকল ইন্দ্রিয়ের স্বামী। যার সাথে এটি যুক্ত হয়ে যায়, সেই ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগকেই অনুভব করে। মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই বাসনা-কামনা সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র সংযোগ হলে কোন সমস্যা নেই, তবে উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি একবার কোনো জায়গায় খুব সুস্বাদু জিলিপি খেয়ে থাকেন, তাহলে সেই স্বাদের অনুভূতি দশ বছর পরেও মনে থাকে, তখন সেই সংযোগই সমস্যার মূল।

ভগবান এখানে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ হয় তবে কেন বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আটকা পড়ে যায় ? আদিগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন যে -

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে বহুদুস্তারে, কৃপয়াऽপারে পাহি মুরারে ॥
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং, গোবিন্দং ভজমূঢমতে।
নামস্মরণাদন্যমুপায়ং, নহি পশ্যামো ভবতরণে ॥

বার-বার জন্ম, বার-বার মৃত্যু, বার-বার মাতৃগর্ভে শয়ন, কেন এত কষ্ট? ভগবান এই বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন।

15.8

শরীরং(য়ঁ) য়দবাপ্নোতি, য়চ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংয়াতি, বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥15.8॥

বায়ু যেমন গন্ধের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও একটি দেহ পরিত্যাগ করার কালে মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দেহকে আশ্রয় করে। ৮ ॥

বিবেচন: আত্মতত্ত্ব সঞ্চিত কর্মগুলিকে কিভাবে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে নিয়ে যায়, শ্রী ভগবান বায়ুর(বাতাস) একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

বায়ু যেমন সর্বব্যাপী হয়েও কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে যায়, একইভাবে আত্মতত্ত্বও সর্বব্যাপী এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। বাতাস যেমন নিজের সাথে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, উভয়ই বহন করে, কিন্তু গন্ধ বাতাসে লেগে থাকে না। একইভাবে, আত্মা একজন মানুষের সঞ্চিত কর্মগুলি বহন করে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে চলে যায় কিন্তু সে শরীরের সাথে লেগে থাকে না। মন ও শরীরের আকর্ষণে জীবাত্মা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নেয়। যে বিচার-ভাবনার সাথে মানুষ দেহ ত্যাগ করে, সেই ভাবনা অনুসারেই সে পরবর্তী যোনিতে জন্ম নেয়।

যেমন কোনো মানুষ যদি নিজের গৃহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার মৃত্যু হয়, তাহলে পরবর্তী জীবনে সে টিকটিকি হয়ে সেই একই গৃহে বিচরণ করে। যদি কেউ ধন-সম্পদের চিন্তা মনে নিয়ে জীবন ত্যাগ করে, তাহলে পরের জন্মে সে

সাপ হয়ে জন্ম নেয়। বায়ু যেমন গন্ধকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে, তেমনি আত্মতত্ত্ব মানুষের সঞ্চিত কর্মকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে বহন করে নিয়ে যায়।

যদি মনুষ্য জীবনের অন্তিম সময়ে ভগবানকে স্মরণ করে তার প্রাণ ত্যাগ করে, ভগবান বলেন যে নিশ্চিত সে আমাকেই প্রাপ্ত করে নেবে, কিন্তু এটা এত সহজও নয়।

গোস্বামী তুলসীদাস জী বলেন-

জন্ম জন্ম মুনি জতনু করাহীं। অंত রাম কহি আবত নাহীं॥
জাসু নাম বল সংকর কাসী। দেত সবহি সম গতি অবিনাসী॥

আপনি সারা জীবনে যখন এর অভ্যাস করেননি, তখন শেষ সময়ে এই নাম মুখে আসা মুশকিল।

উপনিষদে এ সম্পর্কে একটি বিবেচনযোগ্য বিষয় আছে যে, যদি একটি প্রাচীর থাকে এবং তা যদি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে থাকে তবে তা দক্ষিণের দিকেই ভেঙ্গে পড়বে এবং যদি এটি উত্তরের দিকে ঝুঁকে থাকে তবে তা উত্তরের দিকে ভেঙ্গে পড়বে। আমাদের সিস্টেমটিও একটি পেনড্রাইভের মতো যা পূর্বজন্মের সঞ্চিত সংস্কার বহন করে। তাই অনেক সময় আমরা দেখি যে তিন বছরের শিশু গীতার ভক্ত এবং আঠারোটি অধ্যায় মুখস্থ করেছে, বা শিশুটি খুব ভাল সাঁতারু, কেউ খুব ভাল গণিতবিদ। পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফলের কারণেই তারা এই জন্মে এমন করতে সক্ষম হয়।

15.9

শ্রোত্রং(ঞ্) চক্ষুঃ(স্) স্পর্শনং(ঞ্) চ, রসনং(ঙ্) ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং(ব্ঁ), বিষয়ানুপসেবতে॥15.9॥

এই জীবাত্মা মনকে আশ্রয় করে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা- এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় উপভোগ করে থাকে৷ ৯ ॥

শ্রী ভগবান পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন – শ্রবণ, দেখা, স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধ। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই পাঁচটি জিনিস উপভোগ করে।

শ্রোত্রম্ ইন্দ্রিয় (শ্রবণ করার) আমরা সবাই জানি যে হরিণ খুব ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড়ায়, চিতাবাঘ যদি ধরতে চায় তবে একবারে হরিণকে ধরতে পারে না ,তাকে কম পক্ষে ত্রিশ বার হরিণটিকে ধরার চেষ্টা করতে হয়, তবে সে হরিণকে ধরতে পারে। অন্যদিকে একটি শিকারী হরিণটিকে একবারে ধরতে সফল হয় কারণ শিকারী হরিণের দুর্বলতা জানে। সে জানে সংগীত হরিণের প্রিয়। সে যখন হরিণ শিকার করতে বের হয়, তখন সে তার সাথে একটি বিশেষ ধরনের গানের সুরের রেকর্ডিং নিয়ে যায় এবং শিকার করার জায়গায় সেই রেকর্ডিং বাজায়। এই শব্দ হরিণের কানে পৌঁছানোর সাথে সাথে সে সুরের আওয়াজে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। শিকারী যখন দেখে যে হরিণটি এখন গানের সুরে পুরোপুরি মগ্ন, তখন শিকারী হরিণটিকে ধরে তার অণ্ডকোষের পাশ থেকে কস্তুরী বের করে, যার জন্য সে হরিণটিকে শিকার করতে চায় এবং আঘাতপ্রাপ্ত হরিণটিকে ফেলে চলে যায়। .এইভাবে, শব্দের আকর্ষণে হরিণ তার জীবন হারায়।

চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় (দেখার) বর্ষার সময় এবং গ্রীষ্মের সময়,অনেক সময় আমরা রাস্তার আলোতে এবং বাড়ির মধ্যে বাল্ব এবং টিউব লাইটে অনেক পতঙ্গ দেখতে পাই, তারা সারারাত সেই জ্বলন্ত বাল্বগুলিতে ধাক্কা মারতে থাকে। যখন সকাল হয়, তখন আমরা বাল্বগুলির নীচে সেই পতঙ্গগুলিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই হয়ে আসছে। আমরা এটা নিয়ে যখন চিন্তা করি এবং ভাবি যে এই পতঙ্গরা যখন বাল্বগুলিতে ধাক্কা

মারে বা প্রদীপের আগুনে পড়ে, তখন কি তাদের কোন কষ্ট হয় না? তা নয়, তারা ব্যথা অনুভব করে এবং জ্বালাও অনুভব করে। তাহলে কেন এত কিছুর পরেও পতঙ্গরা বারবার একই রকম কাজ করে। এর কারণ হল, পতঙ্গটি প্রদীপ ও বাল্বগুলি থেকে যে আলো দেখতে পায়, তা সে পেতে চায় এবং এই রূপের আকর্ষণে তাকে তার জীবন বিসর্জন দিতে হয়। শব্দের আকর্ষণে হরিণ প্রাণ হারায়, আর পতঙ্গ রূপের আকর্ষণে প্রাণ হারায়।

স্পর্শনম্ ইন্দ্রিয় (স্পর্শের) আমরা সবাই জানি হাতি সবচেয়ে শক্তিশালী, বিশালকায় এবং বুদ্ধিমান প্রাণী। এটি এত শক্তিশালী যে এটি গাছও উপড়ে ফেলতে পারে, এমনকি একটি সিংহও একটি হাতিকে আক্রমণ করতে ভয় পায়। সিংহ জানে যে হাতিটি যদি তাকে নিজের শুঁড়ে জড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেয় তবে তার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। কিন্তু আপনি কি একটি সার্কাসের হাতি বা এমনি কোনো হাতি রাস্তায় হাঁটতে দেখেছেন? সেখানে হাতির সাথে সাথে একটি মাহুত থাকে এবং সে একটি ছোট লাঠির সাহায্যে হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাহুত হাতিকে যেমন যেমন করতে বলে, হাতি সেইরকমই করতে থাকে যেমন হাঁটা, উঠা, সালাম করা, পিঠে বসানো ইত্যাদি। এটাই ভাবার বিষয় যে, এত বিশাল ও শক্তিশালী প্রাণীকে মাহুত কিভাবে নিয়ন্ত্রণে করে? অমাবস্যার রাতে যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে, তখন মাহুত বনের মধ্যে আট ফুট চওড়া, আট ফুট লম্বা এবং আট ফুট গভীর একটি গর্ত খোঁড়ে এবং তার উপর কাঠ রেখে খড় বিছিয়ে দেয়। তরপর সে একটা হস্তিনীর আকৃতির কাঠের ফ্রেম সেই খড়ের ওপর দাঁড় করিয়ে তার উপর হস্তিনীর তাজা গোবর লেপে দেয় এবং তারপরে হস্তিনীর কণ্ঠের একটি রেকর্ডিং বাজায়। হাতিটিকে আকৃষ্ট করার জন্য সে এমনটি করে, যাতে হাতিটি সেদিকে চলে আসে। হস্তিনীর স্পর্শ হাতি খুব পছন্দ করে, তাই সেই হস্তিনীর গোবরের গন্ধ হাতির নাকে পৌঁছলেই হাতি সেই স্পর্শের আশায় সেই দিকেই ছুটে আসে। অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পায় না এবং হস্তিনীকে স্পর্শ করার ইচ্ছায় কাঠের খড়ের উপর পা রাখতেই হাতিটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। গর্তে পড়ার সাথে সাথে হাতিটি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে গর্ত থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু গর্তটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে হাতি যতই চেষ্টা করুক না কেন, এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তবুও ক্রমাগত দুদিন ধরে হাতি নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আসে এমনকি আহতও হয়। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রথম দুদিন মাহুত হাতির কাছে আসে না। দুদিন পর যখন মাহুত এসে গর্তের পাশে দাঁড়ায়, সে দেখে যে হাতির চোখে তখনোও রাগ দেখা যাচ্ছে, তখন মাহুত সেখান থেকে চলে যায়। এভাবে দু-তিন দিন কেটে যায়। এখন হাতি বুঝতে পারে যে সে যতই বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী হোক না কেন, এখান থেকে বের হওয়া তার পক্ষে এখনও অসম্ভব। তৃতীয় দিন সকালে মাহুত আবার হাতির কাছে আসে এবং তাকে দেখে সেখান থেকে চলে যায়। সেইদিন সন্ধ্যায় সে হাতির জন্য কলা ও রুটি নিয়ে আসে এবং এই খাবার হাতির কাছে ফেলে দেয়। যেহেতু হাতিটি তিন দিন ধরে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও আহত, তাই সে মাহুতের দেওয়া রুটি ও কলা তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নেয়। চতুর্থ দিন সকালে, মাহুত আবার এসে হাতির কাছে কলা এবং রুটি ফেলে দেয় এবং চলে যায়। কিন্তু মাহুত যখন চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় আসে, তখন সে হাতিটিকে শুঁড় তুলতে বলে। হাতি যখন শুঁড় তুলে নেয় তখনই সে তাকে রুটি এবং কলা খেতে দেয়। ধীরে ধীরে এখন হাতি বুঝতে পারে যে সে তার শুঁড় তুললেই খাবার পাবে। এভাবে ধীরে ধীরে মাহুত তাকে সবকিছু শেখাতে শুরু করে এবং একই প্রক্রিয়া পরবর্তী সাত দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে মাহুত যখন বুঝে যায় যে হাতিটি সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে, তখন সে হাতিকে গর্ত থেকে বের করে আনে। এখন মাহুত যা বলে, হাতি তাই করে। এখন হাতি মাহুতের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন হয়ে গেছে। যে হাতি সাত দিন আগেও জঙ্গলের রাজা ছিল, জঙ্গলের সিংহও তাকে স্পর্শ করার সাহস পেত না, আজ সেই হাতি হস্তিনীর স্পর্শের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে বাকি জীবনটা সম্পূর্ণভাবে মাহুতের অধীনে কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। স্পর্শের বাসনার জন্যে হাতিটি তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে মাহুতের দাসে পরিণত হয়।

রসনম্, ইন্দ্রিয় (স্বাদের অনুভূতি): জলের মাছের স্বাদের প্রতি আকর্ষণ থাকে। জেলেরা মাছ ধারার জন্যে যখন ছিপ ফেলে, তাতে আটার বল লাগিয়ে দেয়। আটার বলের প্রলোভনে মাছ আটকা পড়ে, আটার বল মুখে দিলেই হুকটি তার ভিতরে আটকে যায় এবং জেলে মাছটিকে ধরে ফেলে। তারপর জেলে আবার ছিপটিতে হুক লাগিয়ে সেই একই আটার বল লাগিয়ে অনেক মাছ ধরে। এমনকি মাছ যদি দেখে যে ছিপটিতে তখনও কোনো মাছ আটকে আছে, তবুও সেই স্বাদের আকর্ষণে মাছটি ছিপে আটকে যায়। এভাবে মাছও স্বাদের আকর্ষণে প্রাণ হারায়।

ঘ্রাণম্ ইন্দ্রিয়(গন্ধ) আপনারা নিশ্চয়ই ভোমরার নাম শুনেছেন। ভগবান ভোমরাকে এত শক্তি দিয়েছেন যে কোনো গাছ যতই শক্ত ও মজবুত হোক না কেন, সে সেই কাঠে গর্ত করে বাসা তৈরি করতে পারে। ভোমরার

সামনের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ, তাই এ শক্ত গাছেও গর্ত করতে পারে। কিন্তু এই ভোমরার কাছে গন্ধ খুব প্রিয়। পদ্মফুল বা অন্য কোন ফুলের মধু গ্রহণ করার জন্য ভোমরা ফুলের উপর গিয়ে বসে। পদ্ম ফুলের বিশেষত্ব হল এটি সকালে সূর্যের আলোয় ফুটে ওঠে এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে এর পাপড়িগুলি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে এবং অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। ভোমরা যখন মধু খেতে পদ্ম ফুলের পাপড়ির ওপর বসে, তখন সে ভুলে যায় যে সন্ধ্যার সময় পাপড়িগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং মধুর গন্ধের লোভে সে ফুলের মধ্যে বসে থাকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যায় যখন তাদের পাপড়ি বন্ধ হয়ে যায়, তখন ভোমরা ফুলের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। তখন কিন্তু ভোমরা চাইলেও তার ধারালো দাঁত দিয়ে পাপড়ি ছিদ্র করে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু গন্ধ ও মধুর লোভে, সে তা করে না এবং পাপড়িতেই আটকে যায়। গন্ধের আকর্ষণে ভোমরাটি প্রাণ হারায়।

এভাবে আমরা দেখি শব্দের আকর্ষণে হরিণ মারা গেল, রূপের আকর্ষণে পতঙ্গ মারা গেল, স্পর্শের আকর্ষণে হাতিকে তার শক্তি ত্যাগ করতে হয়, স্বাদের আকর্ষণে মাছ প্রাণ হারায়। স্বাদ এবং গন্ধের আকর্ষণে ভোমরার মৃত্যু হয়।

এই সমস্ত জীবকে এক একটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তির কারণে প্রাণ হারাতে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন, মানুষের কি গতি হবে। যার শোনার জন্য সুন্দর সংগীত চাই, দেখার জন্য সুন্দর দর্শনীয় স্থান চাই, স্পর্শ করার জন্য মখমলের গদি চাই, খাওয়ার জন্য সুস্বাদু খাবার এবং ঘ্রাণের জন্য সুগন্ধির প্রয়োজন। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তির কারণে মানুষ এই সংসারে বারবার জন্ম নেয় এবং মৃত্যুবরণ করে।

15.10

উত্ক্রামন্তং(ম্) স্থিতং(বঁ্) বাপি, ভুঞ্জানং(বঁ্) বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢা নানুপশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ 15.10॥

শরীর কীভাবে পরিত্যাগ করা হয় এবং অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিতি হয়, গুণ সংযুক্ত হয়ে জীবাত্মা কীরূপে বিষয়াদি ভোগ করেন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা জানতে পারে না, জ্ঞানরূপ নেত্রের সাহায্যে জ্ঞানীগণই তা জানতে পারেন। ১০।

বিবেচন: হে অর্জুন! এই দেহ ত্যাগ করে অথবা দেহে স্থিত থেকে বিষয়কে ভোগ করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হই। যারা বিবেকবান জ্ঞানী, শুধুমাত্র তারাই এই তত্ত্বসমূহ জানেন। ভগবান বলেন, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষরাই এটা উপলব্ধি করেন।

কিছু কিছু মানুষ ভাবেন গুরুর কী আবশ্যকতা আছে। আমরা গীতা শুনে নেবো, কিছুকিছু অধ্যায় পড়ে নেব, তাহলেই জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিতে পারবো, কিন্তু তা হয় না। তার জন্য দিব্য চক্ষু থাকা প্রয়োজন। অর্জুন বললেন, আমি আপনার বিরাট রূপ দেখতে চাই, আপনার বিশ্বরূপ দেখতে চাই, তাই ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলেন। আমরা যদি পরমাত্মাকে জানতে চাই তাহলে আমাদের একজন গুরুর আবশ্যকতা আছে , একমাত্র তিনিই আমাদের দিব্যচক্ষু প্রদান করতে পারেন। ভগবান অর্জুনের কাছে দৃশ্যমান ছিলেন কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দেখার জন্য অর্জুনের দিব্য চক্ষু থাকা আবশ্যিক ছিল। এই গভীর বিষয়গুলি শোনার পরে আমরাও এটা অনুভব করি যে আমরা এইসব কথা বুঝতে পেরেছি কিন্তু বাস্তবে তা আমাদের জীবনে ঘটে না, তাই আমাদেরও এমন একজন গুরুর প্রয়োজন, যিনি আমাদের দিব্যচক্ষু প্রদান করতে পারেন। একদিন সবাইকে এই সংসার ত্যাগ করে যেতে হবে কিন্তু যারা জ্ঞানী, তারা জানেন যে সংসারে এসেছে, তাকে একদিন না একদিন সংসার থেকে চলে যেতেই হবে। এই সংসারে কেউই চিরকাল থাকবেন না।

আমরা সবাই জানি যে সংসারে এসেছে সে একদিন না একদিন চলে যাবেই, তবুও মোহের বন্ধনে আটকে থাকা মানুষ কারো মৃত্যু হলে শোক ও বিলাপ করে। এটাই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য।

এটাই একজন জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য। তাই শুধু ভালো কথা শোনা বা প্রশংসা করাই যথেষ্ট নয়, এই জিনিসগুলোকে আমাদের জীবনে আচরণে আনা উচিত। আমাদের এই জীবন অনন্য, আমরা সৎসঙ্গ ও পূজা-পাঠে নিজেকে নিবিষ্ট রেখে জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারি।

15.11

য়তন্তো য়োগিনশ্চৈনং(ম্), পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্
য়তন্তোপ্যকৃতাত্মানো, নৈনং(ম্) পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।11।।

যত্নশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করে থাকেন, কিন্তু যারা নিজেদের চিত্ত (অন্তঃকরণ) শুদ্ধ করেনি, এরূপ অবিবেকী মানুষ যত্ন করলেও এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না॥ ১১ ॥

বিবেচন:অনেকের মনে একটা প্রশ্ন ওঠে। আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলন করেন। কিছু মানুষ প্রতিদিন হাজারবার, লক্ষবার ভগবানের নাম জপ করে, কেউ কেউ বা তিন-চার ঘন্টা ধরে পূজা-পাঠ করে, তা সত্ত্বেও সেই একই মানুষেরা এমন কিছু কাজ করে তা অত্যন্ত অনুচিত যেমন জমি ও সম্পত্তি নিয়ে গালি-গালাজ করা বা মারামারি করা ইত্যাদি। এইসব দেখে তখন আমাদের মনে হয় যে এরা যে এত পূজা-অর্চনা করে, তাতে লাভ কি?

শ্রী ভগবান বলেছেন যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিন্তু এর সাথে আমাদের বিবেককেও শুদ্ধ করতে হবে। সত্ত্বগুণী ব্যক্তি জানেন যে তার নিজের কি কি অবগুণ(দোষ) রয়েছে। কিন্তু নিজের এই দোষ-গুণ দূর করা অন্য ব্যাপার। সর্বপ্রথম আমাদের জেনে নিতে হবে যে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মোহ, এই অবগুণের মধ্যে কোনটি আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। একজন রজোগুণী বা তমোগুণী ব্যক্তিও তা জানে না। সে নিজের দোষ-গুণগুলি দেখতে অক্ষম এবং সর্বদা অন্যদের ওপর দোষারোপ করে।

আমাদের সকলের এটা মনে হয় যে কি করলে আমরা এই জীবন ও মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, মোক্ষ লাভ করতে পারি এবং ভগবৎ প্রাপ্তি করে নিতে পারি। শুধুমাত্র "কিছু করে নিলেই" হবে না। যারা যোগী, যারা অবিরাম প্রচেষ্টায় লীন থাকেন, তারা নিজের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মাকে জানেন, তাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ। যারা নিজেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেনি ,সেই অজ্ঞানী লোকেরা শত চেষ্টা করেও তা জানতে পারে না। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে আমরা বিশ বছর ধরে গীতা পাঠ করছি, এত বছর ধরে ধ্যান করেছি, ভগবানের আরাধনা করেছি, নাম-জপও করে যাচ্ছি। আমরা এই সবই করি কিন্তু সাথে সাথে যখনই সুযোগ পাই, অন্যের মন্দ করতেও পিছপা হই না। কখনো কখনো এমন কঠোর কথা উচ্চারণ করি যা অন্যের হৃদয়ে আঘাত করে। যখন কেউ এমন করে, তখন অন্যদের মনে সংশয় দেখা দেয় যে এমন অপ্রিয় স্বভাবের মানুষের এত পূজা-পাঠ করে কি লাভ হলো। একইভাবে অন্যদের এটাও মনে হতে থাকে যে যখন এত পূজা-পাঠ করেও মানুষটি এত কটূক্তি করে , তাহলে আমাদের পূজা-পাঠ করেই বা কি লাভ হবে।

শ্রী ভগবান বলেন, অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে মানুষ অজ্ঞানী থেকে যায়। আমাদের প্রযত্ন(অবিরাম চেষ্টা) করতে হবে, আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে তা আচরণেও প্রয়োগ করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের পাপ ত্যাগ না করি, অশুভ ভাবনাকে ত্যাগ না করি, তবে আমরা নিজের পরমাত্মাকে কি করে প্রাপ্ত করতে পারব? আয়নায় যদি বহু বছর ধরে ধুলো জমে থাকে, তাহলে সেই আয়নায় আমরা নিজের প্রতিফলন দেখতে পারি না, কিন্তু কাপড় দিয়ে আয়নার ধুলো মুছে দিলেই কিন্তু আমরা আবার তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। প্রতিবিম্ব কিন্তু সেখানেই রয়েছে কিন্তু ধুলোর কারণে আমরা তা দেখতে পাই না।

আমাদের পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হবে না, তিনি আমাদের সাথেই আছেন। আমরা কেন সেগুলি উপলব্ধি করতে পারি না তার কারণ আমাদের ওপর কামনারূপী ধুলোর আচ্ছাদন পড়ে আছে এবং কর্ম বন্ধনের মলিনতার বোঝা আমাদের পিঠে। ভগবানের নাম-জপ এবং ধ্যানের মাধ্যমে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, কিন্তু এই সব আমাদের অন্তর

থেকে করতে হবে, তবেই আমরা শুদ্ধ হতে পারব। আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে আমরা জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবো না। আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে আমরা সর্বত্র ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত করতে পারবো।

15.12

য়দাদিত্যগতং(ন্) তেজো, জগদ্ভাসয়তেখিলম্
য়চ্চন্দ্রমসি য়চ্চাগ্নৌ, তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।12।।

সূর্যকে আশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই বলে জানবে। ১২ ॥

বিবেচন: ভগবান বলেন, হে অর্জুন! যে তেজ সূর্যের মধ্যে থাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে, সেই তেজ চন্দ্রেও রয়েছে এবং সেই তেজ অগ্নিতেও রয়েছে, আমাকেই সেই তেজের উৎস বলে জেনে নাও।

পরের তিনটি শ্লোকে ভগবান তাঁর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবান কিছু কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের বলেন যে আমি সর্বত্র উপস্থিত, ব্যাপ্ত। তিঁনি বলেন, সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে জ্যোতি দৃশ্যমান, তা আমারই তেজ। ভগবান শক্তি অবতার করেন। তিঁনি বলেন যে আকাশকে ধারণ করে রাখার শক্তি, চন্দ্রমার যে রসাত্মক শক্তি, এই সব আমিই। অভ্যাস বিনা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ: যেমন মোবাইলে যদি ভগবানের কোনো স্তোত্র বা কথা ডাউনলোড করতে হলে আমরা বলি, ফোনের মেমরি কম। যদিও আমরা অন্য ভিডিও সরিয়ে ফোনের মেমরি খালি করতে পারি, কিন্তু আমরা তা করি না, কারণ আমরা আসক্তিতে জড়িয়ে থাকি। কিন্তু জায়গা খালি না করলে ভগবানের কোনো স্তোত্র বা কথা ডাউনলোড করা যাবে না। তেমনি আমরা যদি নিজের বুদ্ধিকে এমন অবাঞ্ছিত বিচার-ভাবনা দিয়ে ভরে রাখি তাহলে আমাদের অন্তঃকরণ কিভাবে শুদ্ধ হবে? আমরা ভাবি যে যেন কিছুই সরাতে না হয় এবং সবকিছুই যেন এসে যায়। একইভাবে, আমরা চাই যে জীবনে যেন আমাদের কিছুই ত্যাগ না করতে হয় আর আমি ভগবানকে প্রাপ্ত করে নিই, কিন্তু এটা তো হতে পারে না। আগুনের শক্তি দুই প্রকার; একটি হল দহন করার শক্তি এবং অন্যটি হল আলোকিত করার শক্তি। আমরা রান্নাঘরের গ্যাসের আগুনে খাবার রান্না করতে পারি কিন্তু সেই আগুনের আলোয় পড়াশুনা করতে পারি না। আমরা চাঁদের আলোয় পড়াশুনা করতে পারি কিন্তু সেই আলোয় রান্না করতে পারি না কারণ তা দহন করতে পারে না। সূর্যের আলোতে দহন করার এবং আলোকিত করার, উভয় শক্তিই আছে। ভগবান বলেন যে আমার মধ্যে দহন এবং আলো, উভয়ই আছে। আমিই জ্যোতি, সমস্ত জ্যোতিই আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

15.13

গামাবিশ্য চ ভূতানি, ধারয়াম্যহমোজসা
পুষ্ণামি চৌষধীঃ(স্) সর্বাঃ(স্), সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।13।।

আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে নিজ শক্তির সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি এবং আমিই রসযুক্ত চন্দ্রের রূপে ওষধি (বনস্পতি) সমূহকে পরিপুষ্ট করি৷ ১৩ ॥

বিবেচন: ভগবান বলেন, আমিই এই সংসারে প্রবেশ করে এই করি। আমিই রসময় এবং অমৃতময় চন্দ্র হয়ে সমস্ত বনস্পতিগুলিকে পুষ্ট করি। ভগবান স্থুল রূপের বর্ণনা করে সূক্ষ্ম রূপের কথাও বলেছেন। সূর্য ও চন্দ্র তো অনেক দূরে স্থিত। ভগবান এই শ্লোকে উদাহরণের মাধ্যমে বলেছেন যে মানুষের নিকটবর্তী যা যা কিছু আছে, সবেতেই আমি রয়েছি। ভগবান বলেছেন যে পৃথিবীর মাটিতে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে ধারণ করে রয়েছি। সমস্ত ঔষধি আমার দ্বারাই প্রস্ফুটিত হয়।

15.14

অহং(ব্ঁ) বৈশ্বানরো ভূত্বা, প্রাণিনাং(ন্) দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ(ফ্), পচাম্যন্নং(ঞ্) চতুর্বিধম্॥15.14॥

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়ে বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে চতুবিধ প্রকারের অন্ন পরিপাক করি৷ ১৪ ॥

বিবেচন: হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর দেহে স্থিত প্রাণ এবং অপান দ্বারা যুক্ত হয়ে আমি চার প্রকার খাদ্য পরিপাক(হজম) করি।

অগ্নি তিন প্রকারের হয়। এখানে ভগবান বৈশ্বানর অগ্নির কথা বলেছেন। একটি বড়বাগ্নি(সমুদ্রস্থিত অগ্নি), একটি হয় দাবাগ্নি এবং একটি জঠরাগ্নি। বড়বাগ্নি যা সাগরে দেখা যায়, দাবাগ্নি যা বনে দেখা যায় এবং জঠরাগ্নি যা আমাদের পেটে খাবার হজম করে। ভগবান বলেন আমি সেই অগ্নি।

চার প্রকারের খাদ্য আছে যা শুধু আমিই হজম করিয়ে দিই। চার প্রকারের খাদ্য কি কি? ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য এবং চোষ্য (যা যথাক্রমে চিবিয়ে খাওয়া, পান করা, চেটে খাওয়া ও চুষে খাওয়া হয়)।

প্রাণও পাঁচ প্রকারের হয় : ব্যান, সমান, অপান, উদান ও প্রাণ। ভগবান বলেন আমি এই দিয়েই সব খাবার হজম করি। সূর্যের শক্তি বনস্পতিকে পরিপক্ক করে তোলে, রাত্রির শীতলতা শিশিরকে পুষ্ট করে। বনস্পতি শুধুমাত্র সূর্যের আলো দ্বারা পরিপক্ক হয় না। প্রথমে সূর্যের আলো ও তারপর চাঁদের শীতলতা পেয়েই বনস্পতি পুষ্ট হয়ে পরিপক্ক হয়, তবেই আমাদের শরীরকে সেই বনস্পতি পুষ্টি যোগায়।

খাদ্য আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের জঠরাগ্নি খাবার হজম করে। আমরা যদি উল্টোভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ও খাবার খাই, তবুও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে গিয়ে খাদ্য আমাদের পেটে যায়। এই সবই হচ্ছে প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারাই সম্ভব হয়, তারপর জঠরাগ্নি তা পরিপাক করে রক্ত থেকে মজ্জা এবং তারপর অস্থিতে পরিণত হয়। সূর্য ও চন্দ্রে যে শক্তি থাকে সেই একই শক্তি আমাদের শরীরের প্রতিটি রোমে শক্তির রূপে আসে। আমরা যে খাবার খাই তা ভগবানই জঠরাগ্নি রূপে আমাদের শরীরে পরিপাক করান। সূর্যাস্তের আগে খাবার খেয়ে নেওয়া উচিত, কারণ সেই সময়ে জঠরাগ্নি সবচেয়ে প্রবল থাকে, সূর্যাস্তের পরে এর তীব্রতা হ্রাস পায়।

15.15

সর্বস্য চাহং(ম্) হৃদি সন্নিবিষ্টো,
মত্তঃ(স্) স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং(ঞ্) চ
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো,
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।15।।

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমা হতেই সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (সংশয়াদি দোষের নাশ) হয়ে থাকে। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বেদার্থের জ্ঞাতাও আমি-ই॥ ১৫ ॥

বিবেচন: ভগবান বলেন আমি বাইরে কোথাও নই, শুধু তোমার ভিতরেই রয়েছি। আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে স্থিত রয়েছি। আমার থেকেই **স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন(**বিলোপ) হয় এবং সমস্ত বেদের দ্বারা আমাকে জানা যায়।

স্মৃতি অর্থাৎ অতীতের কথা। অতীতে যা কিছু আমরা মনে রাখি এবং অনুভব করেছি, সেটাই স্মৃতি।

জ্ঞান অর্থাৎ নতুন কিছু শেখা, নতুন কিছু শোনা, নতুন কিছু জানতে পারা, এটাই জ্ঞান।

অপোহন অর্থাৎ বিচার-ভাবনার সংশয়ের নিবারণ। অনেকসময় আমাদের মনে হয় যে, আমরা যা জানি সেটা ঠিক কি না বা এটা ঠিক নাকি ওটা ঠিক, এই হলো মনের সংশয় আর সেই সংশয়ের নিবারণ হলো অপোহন ।

এই সমস্ত শক্তি আমার কাছ থেকে আসে এবং আমিই বেদের মাধ্যমে জানার যোগ্য।

15.16

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে, ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষরঃ(স্) সর্বাণি ভূতানি, কূটস্থোক্ষর উচ্যতে।।16।।

এ জগতে ক্ষর (বিনাশশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী) –এই দু'প্রকারের পুরুষ অবস্থিত। তার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর দেহ বিনাশশীল এবং কূটই (জীবাত্মা) হল অবিনাশী ॥ ১৬ ॥

বিবেচন: এই পৃথিবীতে দুই ধরনের জীব আছে, নাশবান(যার বিনাশ হয়) এবং অবিনাশী। উভয়ই ভিন্ন-ভিন্ন নামে পরিচিত, ক্ষর ও অক্ষর, দেহ ও দেহী, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, যোনি ও বীজ, পুরুষ ও প্রকৃতি।
এ সবই একই জিনিস। মৃত্যু হয়ে গেলে এই শরীর পুড়ে যায় কিন্তু আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। সে পরবর্তী দেহে চলে যায়। সমস্ত ভূতমাত্রের শরীর নাশবান এবং জীবাত্মা অবিনাশী।

15.17

উত্তমঃ(ফ্) পুরুষস্ত্বন্যঃ(ফ্), পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
য়ো লোকত্রয়মাবিশ্য, বিভর্ত্যব্যয়ঈশ্বরঃ॥17॥

কিন্তু উত্তম পুরুষ হলেন অন্য বিশিষ্ট একজন, যাঁকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। সেই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিবেচন: প্রকৃতি ও মানুষের চেয়ে যিনি উত্তম, তিনি হলেন পুরুষোত্তম ঈশ্বর এবং তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পুরুষোত্তম - প্রকৃতি এবং পুরুষের চেয়ে উত্তম। যিনি ঘটে ঘটে আছেন এবং তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন।

আমরা এবং পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। এটা সত্য কিন্তু এক হওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মা আমাদের থেকে উচ্চস্তরে স্থিত। পরমাত্মা আমাদের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমরা পরমাত্মাকে সৃষ্টি করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, যদি সমুদ্র থেকে জলের একটি বিন্দু আলাদা করে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে সেই জলের বিন্দুর ও সমুদ্রের জলের বৈশিষ্ট্য একই হবে। কিন্তু সেই জলের বিন্দুকে সমুদ্র বলা যাবে না। সেই জলের বিন্দু যদি সমুদ্রে মিশে যায়, তাহলে আবার সমুদ্রের অংশে পরিণত হবে। একইভাবে, পরমাত্মা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা পরমাত্মার একটি অংশ এবং অন্তিম সময়ে আমরা তাঁর সাথে একীভূত(একত্রিত) হয়ে যাব।

15.18

য়স্মাত্ক্ষরমতীতোহম্, অক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোস্মি লোকে বেদে চ, প্রথিতঃ(ফ্) পুরুষোত্তমঃ।।18।।

আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে আমি প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

বিবেচন: শ্রী ভগবান বলেছেন, আমি নাশবান জড় জগতের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী জীবাত্মা থেকেও উত্তম। তাই ত্রিজগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

ভগবান এই শ্লোকে নিজেকে পুরুষোত্তম বলে অভিহিত করেছেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম পুরুষোত্তম যোগ। যদিও

আত্মা এবং পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন, তবুও পরমাত্মার পরিচয় শ্রেষ্ঠ। এক বিন্দু জল ও সাগরের মূল তত্ত্ব একই কিন্তু যতক্ষণ জলের বিন্দু সাগর থেকে আলাদা, ততক্ষণ তাকে সাগর বলা যায় না, ঠিক সেই প্রকারেই আত্মা ও পরমাত্মা এক হওয়া সত্ত্বেও তারা ভিন্ন ভিন্ন। এভাবেই প্রকৃতি, পুরুষ ও পুরুষোত্তম এই তিনটি ভিন্ন সত্তা।

15.19

য়ো মামেবমসম্মূঢো, জানাতি পুরুষোত্তমম্
স সর্ববিদ্ভজতি মাং(ম্), সর্বভাবেন ভারত।।19।।

হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন! এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারেন, তিনিই সর্বজ্ঞ হন এবং তিনি সর্বতোভাবে আমারই ভজনা করে থাকেন৷ ১৯ ॥

বিবেচন: শ্রী ভগবান বলেন, যে ব্যক্তি আমার পুরুষোত্তম স্বরূপকে জানে সে আমাকে বাসুদেব রূপে পূজা করে, যে পরমেশ্বরকে জানে সে সমস্ত মোহ-মায়া থেকে মুক্ত হয়ে আমার চিন্তন করে। যিনি জ্ঞানীপুরুষ, তিনি এই পরম তত্ত্ব জানেন।

15.20

ইতি গুহ্যতমং(ম্) শাস্ত্রম্, ইদমুক্তং(ম্) ময়ানঘ
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্স্যাত্, কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।20।।

হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি এরূপে এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য তোমাকে জানালাম। হে ভারত ! এটি জেনে মানুষ জ্ঞানী (স্নাত-জ্ঞাতব্য তথা প্রাপ্ত প্রাপ্তব্য) এবং কৃত-কৃতার্থ হয়৷ ২০ ॥

হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই ভাবে আমি তোমায় এই এটি রহস্যময় অতিগুহ্য গোপন শাস্ত্র তোমায় বললাম। ভগবান এই অধ্যায়কে অত্যন্ত গোপন শাস্ত্র বলেছেন অর্থাৎ যে এই জ্ঞানের অধিকারী সেই শুধুমাত্র জানবে। যে বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী ব্যক্তি এটা জানতে পারে, সেই মানুষ কৃতার্থ হয়। ভগবান বলেছেন আমার জ্ঞান আমি আমার প্রিয় ভক্তদের দান করি। আমাদের মনে হতে পারে আমরা তো গীতা শুনছি, গীতা পড়ছি। কিন্তু সত্যি এটাই যে আমরা গীতাকে বেঁচে নিইনি, ভগবানের আমাদের ওপর কৃপা হয়েছে আর উনি আমাদের এই কার্যে বেছেছেন। কোথাও গীতার একটা অধ্যায় পড়ার হয়, তাহলে এই অধ্যায়টাই পড়া হয় কারণ এই অধ্যায় এক সম্পূর্ণ শাস্ত্র। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে ভগবান সব কথা এখানে বলেছেন আর গীতা এখানেই সমাপ্ত। অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সারাংশ। হরি নাম সংকীর্তনের পর আজকের সত্র সমাপন হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো।

::প্রশ্নোত্তর পর্ব::

প্রশ্নকর্ত্রী : মনীষা দিদি
প্রশ্ন : আপনি বললেন শুধু শরীর পার্টিবার্তান হয়, কিন্তু আমাদের তো বিচারেরও পরিবর্তন হয়। ছোটবেলায় আমরা খুব সরল থাকি তারপর সব পাল্টায়। আমরা কি ভগবানের জন্য কর্ম করতে পারি?
উত্তর : যা দৃশ্যমান তা স্থূল শরীর। সেটা পাল্টায়। মন, চিত্ত, বুদ্ধি - যা সূক্ষ্ম শরীর, তাও পাল্টায়। হ্যাঁ আপনি নিশ্চয়ই ভগবানের জন্য কর্ম করতে পারেন। প্রশ্ন হচ্ছে কর্মের সময় আপনার মনে কি ভাব আছে? যদি ভগবৎ ভাবনা থাকে তাহলে সেটা ভগবানের কাজ। আজ মনে বাসনা থাকলে সেটা সাংসারিক কাজ। ভাগবদ্ভাবনা আপনার কাজকে পূজায় পরিণত করবে। আমাদের এই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমরা অহংকারের বশে নিজেকে কর্তা ভেবে ফেলি। ব্যাংকের ক্যাশিয়ার যেমন টাকা গোনে। কম বা বেশি হলে তার ব্যক্তিগত কোনো লাভ ক্ষতি নেই। আমাদের সেই ভাবে কাজ করতে হবে। অহংকারকে দূরে রাখলে আমাদের কর্মও পূজায় পরিবর্তিত

হবে।

প্রশ্নকর্ত্রী : খুশবু দিদি
প্রশ্ন : বাচ্ছাদের গীতাপাঠ করতে চাই কিন্তু ওদের মনে অনেক প্রশ্ন। কৃষ্ণ তো গীতায় নিজের প্রশংসা করেছেন, এটা কি উচিত? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আর আমার পুজোয় মন লাগে না, জপ করতে পারি। এটা কি সঠিক কাজ হচ্ছে?
উত্তর: বাচ্ছাদের বোঝানোর চেয়ে পুরস্কৃত করে শ্লোক মুখস্থ করান। বোঝার জন্য পুরো জীবন পড়ে আছে আর কারও কারও বুঝতে তো একাধিক জন্ম লাগে। আপনার জপ করতে ভালো লাগে, সেটা তো ভালো কথা। ভক্তি নয় প্রকারের, যে ভক্তিতে আপনার মন লাগে সেটা বেশি করে করুন আর বাকি ভক্তিও অল্প অল্প করুন। এমন নিয়ম রাখুন যে এতো সংখ্যক জপ না করে শুতে যাবো না। এমন না হয় যে অন্য পুজোও করলাম না আর জপও নামমাত্র করছি। তাহলে কিন্তু জীবনে কল্যাণ হবে না।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং(য়ঁ) য়োগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তময়োগো নাম পঞ্চদশোऽধ্যায়ঃ।।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||